মানবপাচারের ক্ষতির ধরণ ও ব্যাপকতা

মানবপাচার থেকে কি আমরা বা কি আমাদের দেশ অর্থনৈতিকভাবে লাভবান নয়, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। মানবাধিকারের গুরুতর লঙ্ঘন, রেমিটেন্স বা প্রবাসী আয়ের হ্রাস, পাচারের অর্থে পাচারকারী দলের শক্তি বৃদ্ধি, দেশের জন্য ক্ষতিকর সেবা বা পণ্য ক্রয়, বহি:বিশ্বে দেশের সুনামহানি এসবই আসলে গুরুতর বিষয়। এরপরও এ ধরণের তালিকা থেকে মানবপাচারের ক্ষতির ধরণ ও ব্যাপকতা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া কঠিন। মানবপাচার থেকে রেমিটেন্স বা প্রবাসী আয়ের বৃদ্ধি নয়, কেবল হ্রাস কেন, এটাও একটা তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়।

মানব পাচারের ভিকটিমের অর্জিত অর্থ (যদি থাকে) কদাচিৎ বৈধ চ্যানেলে উৎস দেশ বা হোম কান্ট্রিতে আসে। প্রায় শতভাগ ক্ষেত্রেই এ অর্থ যায় বিদেশে অবস্থানরত মানবপাচারকারী কিংবা তাদের সহযোগী হুন্ডি- ব্যবসায়ীদের হাতে। বিদেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানব পাচারকারী নিজেকে হুন্ডি-ব্যবসায়ী পরিচয়ে মানব পাচারের ভিকটিমসহ বৈধ-অবৈধ নির্বিশেষে প্রবাসী শ্রমিকদের কাছ থেকে বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করে (১)। এখন সংগৃহীত বৈদেশিক মুদ্রাতো বিদেশেই থেকে যায়। তো, বৈদেশিক মুদ্রা প্রদানকারী প্রবাসী শ্রমিকের হোম কান্ট্রিতে পরিশোধ হবে কি করে?

এ অর্থ যদি বৈধ চ্যানেলে আসে (চিত্র ১-এর প্রবাহ ২), তা'হলে এ বৈদেশিক মুদ্রার বিপরীতে অর্থ প্রদান করে অথারাইজড ডিলার (চিত্রে নিয়ামক 'ছ' ও প্রবাহ ৩)। অবৈধ চ্যানেলে আসা নয়, থেকে যাওয়া (চিত্রে প্রবাহ ১ ও ৭) বৈদেশিক মুদ্রার বিপরীতে অর্থ প্রদানের কাজটি কিভাবে হয়? অর্থাৎ হোম কান্ট্রিতে কেউ একজন (দেশী হুন্ডিওয়ালা – নিয়ামক 'ঙ') কোন অর্থ না পেয়ে কেনো কিভাবে প্রবাসি শ্রমিক কিংবা মানব পাচারের শিকার (নিয়ামক 'ক') থেকে বিদেশে সংগৃহীত অর্থ দেশে পরিশোধ করবে?

হোম কান্ট্রিতে এ অর্থ পরিশোধিত হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোন অবৈধ পণ্য (যেমন- মাদক) বা অবৈধ সেবার (যেমন- দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত অর্থ বিদেশে পাচারের প্রয়োজনে, চিত্রে প্রবাহ ৪) বিপরীতে সংগৃহীত দেশীয় মুদ্রা দিয়ে (চিত্রে প্রবাহ ৪, ৫ ও ৬) ।

চিত্র ১. পাচারের অর্থ প্রবাহ কিভাবে দেশের বারোটা বাজায়?

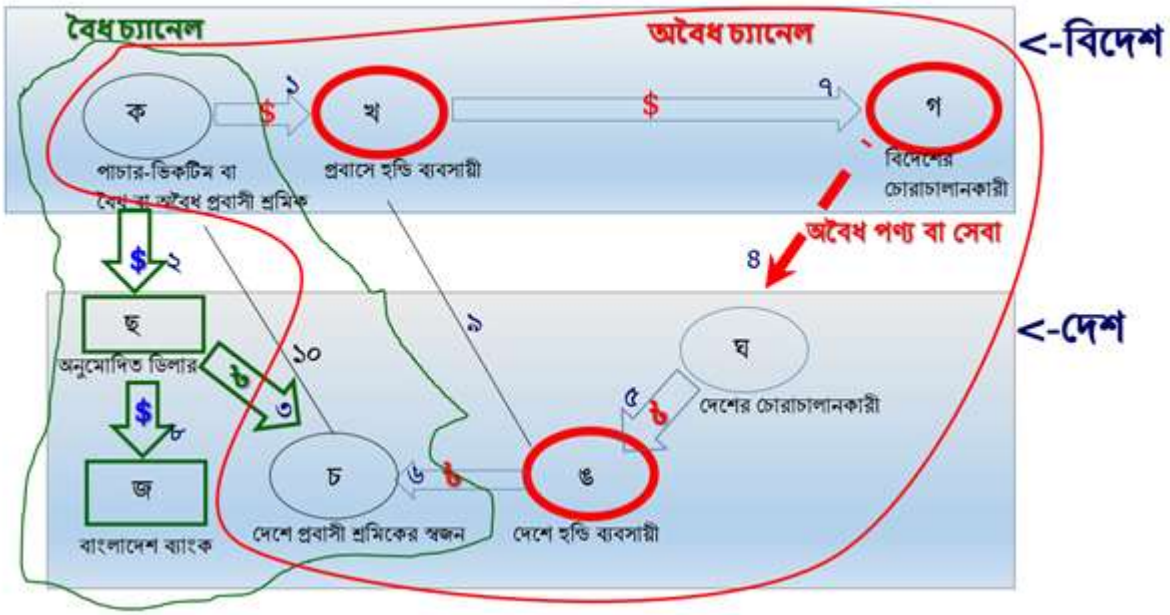

কাজটি যতটা কঠিন ভাবছেন, আসলে তার চেয়েও কঠিন। বিদেশে মানবপাচারকারী বা হুন্ডিওয়ালার সংগৃহীত অর্থের বিপরীতে (চিত্র ১-এর প্রবাহ ১) দেশে অর্থের সংস্থান করা না গেলে (চিত্রে প্রবাহ ৬) এ চক্রকে বিচিত্র রকম অবৈধ সেবা বা পণ্যের উপর ভরসা করতে হয়(চিত্রে প্রবাহ ৪ ও ৫)।

ধরুন, লিবিয়ার কিছু মানব পাচারকারী মধ্য-প্রাচ্যের কিছু অবৈধ বা বৈধ দেশীয় শ্রমিক থেকে বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করেছে (চিত্র ১-এর নিয়ামক ‘খ’); এবং এর বিপরীতে মধ্য-প্রাচ্যে অবৈধ সেবা বা পণ্য প্রদান বা গ্রহণকারী এমন কেউ নেই (চিত্র ১-এর নিয়ামক ‘ঙ’), হোম কান্ট্রিতে যে অর্থ দেশে পরিশোধের ব্যবস্থা করবে। সেক্ষেত্রে অনেক সময়ই চক্রটি মধ্য-প্রাচ্য থেকে ইউরোপে চাকুরির প্রলোভন দেখিয়ে প্রবাসী বাংলাদেশীদের জড়ো করে তাদেরকে পিটিয়ে মুক্তিপণের অর্থ সংগ্রহ করে (চিত্র ২)

এভাবে জংগী হামলা বা রাষ্ট্র-বিরোধী সহিংসতার জন্য অর্থায়ন অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যাংকিং চ্যানেলে নয়, হুন্ডি চ্যানেলে পরিশোধিত হয়। তো, আপনারা বুঝতেই পারছেন, বিদেশে ভিকটিমকে আটকে রেখে দেশে মুক্তিপণ আদায় করা হলে পরিশোধকৃত মুক্তিপনের অর্থ সাধারণত হুন্ডির মাধ্যমে বিদেশে অবস্থানরত মানবপাচার চক্রের হাতে পৌঁছায়।

চিত্র ২. দেশে সংগৃহীত মুক্তিপণের অর্থ কিভাবে বিদেশে পরিশোধিত হয়?

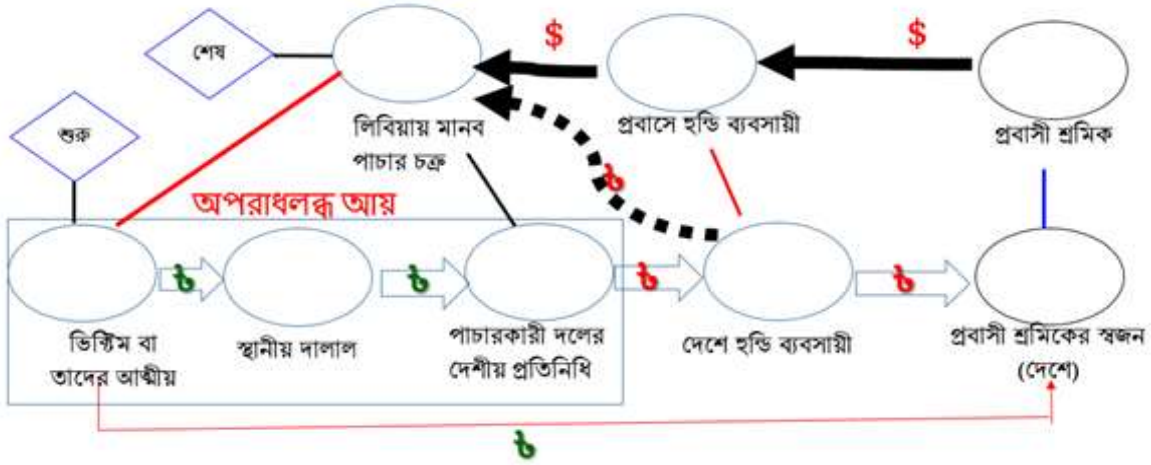

বিদেশে অবস্থানরত হুন্ডি ব্যবসায়ী ভিকটিমের দেশের প্রবাসী শ্রমিকের কাছ থেকে ফরেন কারেন্সি সংগ্রহ করে মানবপাচার চক্রের বিদেশে অবস্থানরত মূল হোতাকে পরিশোধ করে। তার বিপরীতে পাচারের উৎস-দেশের হুন্ডিওয়ালা (‘দেশী হুন্ডিওয়ালা’) দেশীয় মুদ্রায় প্রবাসী শ্রমিকের (বাংলাদেশী) আত্মীয়-স্বজনকে অর্থ পরিশোধ করেন। তাহলে যা দাঁড়ায়, তা হচ্ছে, অপরাধ লব্ধ আয় বিদেশে পাচার করার জন্য প্রবাসে থাকতে হবে প্রবাসী শ্রমিকের আয়; আর দেশে থাকতে হবে দেশীয় মুদ্রায় অর্থ গ্রহণেচ্ছু প্রবাসী শ্রমিকের স্বজন। তা'ছাড়া রপ্তানি বাণিজ্যে আন্ডার-ইনভয়েসিং কিংবা আমদানি বাণিজ্যে ওভার-ইনভয়েসিংও বিপুল পরিমাণ অর্থ পাচারে ভূমিকা রাখে।

চিত্র ৩.রপ্তানীকালে আন্ডার-ইনভয়েসিংয়ের মাধ্যমে কিভাবে বিদেশে অর্থ পাচার হয়?

তাই দুর্নীতি, মানবপাচার, মাদকপাচারসহ যে কোনো ট্রান্স-ন্যাশনাল ক্রাইমে অর্থ তথা অপরাধলব্ধ আয়ের প্রবাহ সহজভাবে সচল রাখতে গেলে সে দেশে থাকতে হবে বাংলাদেশের বৈধ বা অবৈধ প্রবাসী শ্রমিক, আন্ডার ইনভয়েসিং-এর জন্য রপ্তানি দ্রব্য, কিংবা ওভার-ইনভয়েসিং-এর জন্য আমদানি দ্রব্য।

চিত্র ৪.আমদানীকালে ওভার-ইনভয়েসিংয়ের মধ্যমে কিভাবে বিদেশে অর্থ পাচার হয়?

বিদেশে ঘুষ-দূর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত অররথ ও হুন্ডির মাধ্যমে পাচার করা হয়। অন্য কথায়, আমরা যখন বলি বা প্রচার করি, এস আলম বাংলাদেশ থেকে ২০ লক্ষ কোটি 'টাকা' পাচার করে নিয়ে গেছে, আমরা আসলে ভুল বলি। আদতে এস আলম এক 'টাকা'ও 'দেশের বাইরে পাচার' করেনি।

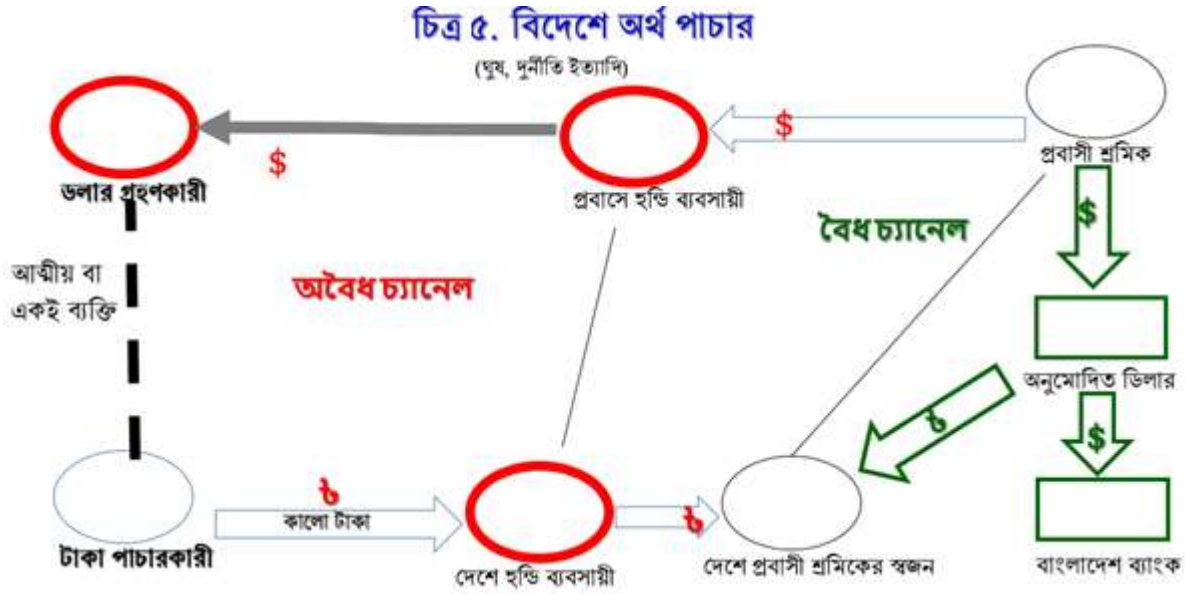

কারণ 'টাকা' বিনিময়যোগ্য মুদ্রা হওয়া স্বত্ত্বেও মোটা দাগে বলা চলে দেশের বাইরে 'টাকা' 'চলেই না'। আসলে, এস আলম, দেশের বাইরে (ধরুন, মালয়েশিয়ায়) প্রবাসী শ্রমিকের অর্জিত মহা-মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করে নিয়ে হুন্ডি প্রক্রিয়ায় দেশে অর্জিত কালো টাকা বা দূর্নীতির টাকা প্রবাসী শ্রমিকের আত্মীয়-স্বজনদের পরিশোধ করার ব্যবস্থা করেছে।

আপাত-নিরীহ হুন্ডি প্রক্রিয়ার এ ভয়াবহ দিকটা খুব কম মানুষই খেয়াল করেন। সেটা হচ্ছে, বৈধ চ্যানেলে সংগৃহীত বৈদেশিক মুদ্রার বিপরীতে দেশে হোম কান্ট্রিতে দেশীয় মুদ্রায় অর্থ পরিশোধের জন্য যেমন অনুমোদিত ডিলার রয়েছে, অবৈধ চ্যানেলে তথা হুন্ডি প্রক্রিয়ায় সংগৃহীত বৈদেশিক মুদ্রার বিপরীতে হোম কান্ট্রিতে দেশীয় মুদ্রায় অর্থ পরিশোধের জন্য প্রামাণ্য কোন ব্যবস্থা নেই। হুন্ডিওয়ালাকে ঘুষ, দুর্নীতির মতো অবৈধ সেবা, কিংবা মাদক, পর্নগ্রাফির মতো অবৈধ পণ্যের সেবার মূল্য বিদেশে মহামূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রায় পরিশোধ করে, সেই পণ্য বা সেবার বিপরীতে সংগৃহীত অর্থ দিয়ে হুন্ডির দায় দেশে পরিশোধ করার জন্য বাধ্যতামূলকভাবে নির্ভর করতে হয়।

এবার, উল্টো কথা বলি। বেসরকারী জরিপে দেশে মাদকের কারণের ব্যয় বা ক্ষতি বছরে ১ লক্ষ কোটি টাকা (বা ৩ বিলিয়ন ইউএস ডলার, যা কিনা ৩টী পদ্মা সেতুর নির্মান ব্যয়ের সমান) বলে দাবি করা হয়। চিত্র ১. বা পরবর্তী মডেলগুলো ব্যবহার করে ভারত, পাকিস্তান, মিয়ানমার বা আফগানিস্থানের মতো দেশে মাদকের এ বিপুল পরিমাণ অর্থ পরিশোধ সম্ভব নয়। কেন? কারণ, এসব দেশে এতো বিপুল পরিমাণ অর্থ উপার্জনের মতো প্রবাসী শ্রমিকের সেবা, কিংবা রপ্তানি পণ্য নেই; এমন কি, অভার-ইনভয়েসিং-এর জন্য এতো বিপুল অংকের আমদানিও নেই! সেক্ষেত্রে, কী করা যায়? খুব সীমিত ক্ষেত্রে 'বাটা' বা দ্রব্য বিনিময় কিংবা কারেন্সী সোয়াপ বা সরাসরি স্থানীয় মুদ্রায় ক্রয় অর্থ পাচারের উপায় হতে পারে।

তবে প্রদেয় অর্থের একটা বড়ো অংশই, সংশ্লিষ্ট চক্রকে অনেক ঝুঁকি নিয়েই বিদেশে অর্জিত মুল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা সরাসরি বহন করে পৌছে দিতে হবে, যা কিনা যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ। অতএব, অন্য বিকল্পটি হচ্ছে, বৈদেশিক মুদ্রায় সোনা কিনে তা সরাসরি বহন বা পাচার করা (চিত্র ৬)। চিত্রে দেখা যাচ্ছে, প্রবাসের হুন্ডি ব্যবসায়ী কিভাবে হম কান্ট্রির

চিত্র ৬. সোনার দেশে সোনা এলে আমরা কেন রাগ করি?

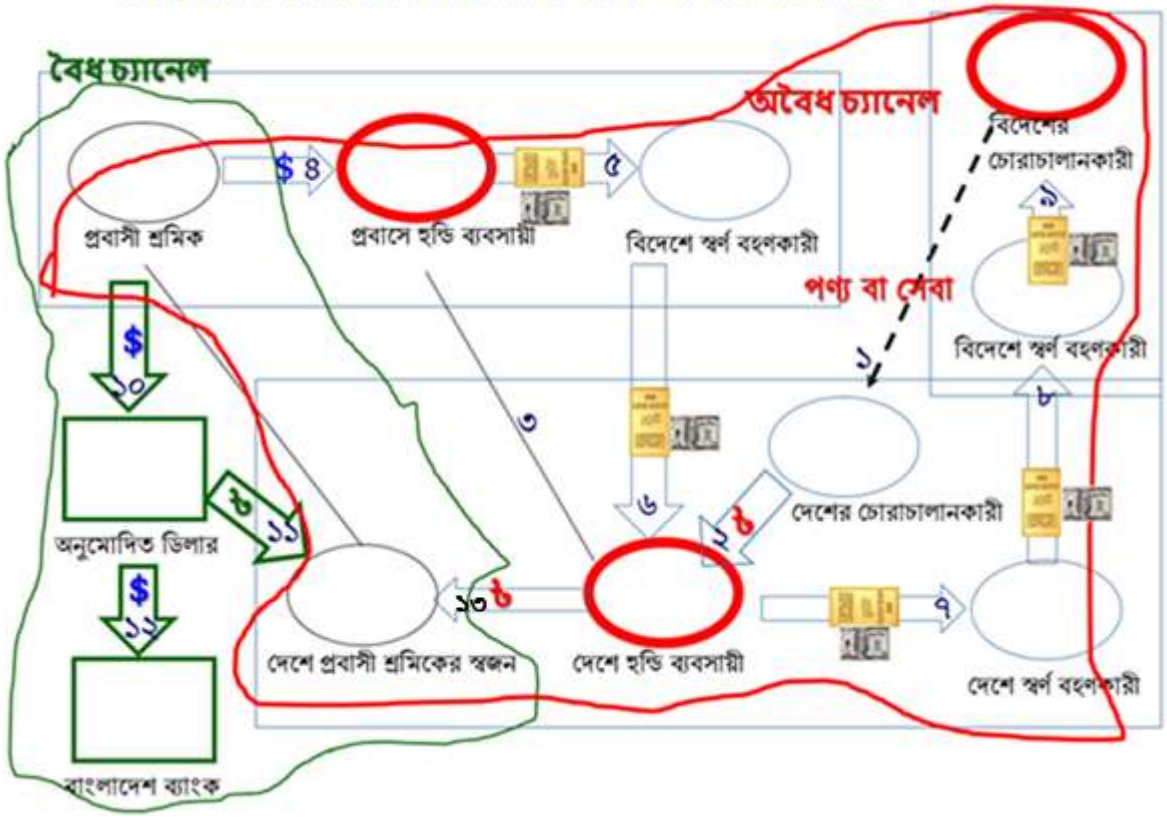

চিত্র ৬. দেখে এবার বলুনতো, দুবাই থেকে ১৫ লক্ষ টাকায় একটা সোনার বাট কিনে ৫০ হাজার টাকা ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে বাংলাদেশে ঢুকে গেলে বাংলাদেশের ক্ষতি কতো? কী, ৫০ হাজার টাকা! ভুল বলেছেন। ১৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা! জ্বী, ভুল শুনেন নি। এবার বলুন, কেন? চিত্র ৬. দেখে বুঝতেই পারছেন, এ সোনা কেনা হয়, মহা-মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা দিয়ে (প্রবাহ ৪ ও ৫), যা কিনা দেশে আসে (প্রবাহ ৬) চলে যাবার জন্য (প্রবাহ ৭, ৮ ও ৯) - পণ্যের মূল্য (প্রবাহ ১) পরিশোধের উদ্দেশ্যে!

যাই হোক, মানব পাচার প্রক্রিয়ায় আদায়কৃত মুক্তিপণের অর্থ কিংবা অন্য যে কোন অর্থ বা অপরাধলব্ধ আয়, হুন্ডির মাধ্যমে বিদেশে পাচার হলে নিম্নবর্ণিত ৩টি ঘটনা ঘটে।

এক, উৎস দেশের বৈধ ও অবৈধ প্রবাসী শ্রমিকের অর্জিত অর্থ বা বৈদেশিক মুদ্রা দেশে আসতে পারে না - বিদেশেই থেকে যায়। আন্তর্জাতিক শ্রম বা পণ্য বাজারে ‘দেশীয় শ্রম বা পণ্য-এর বিনিয়োগ’ বিফলে যায় বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

দুই, হুন্ডির মাধ্যমে থেকে যাওয়া বৈদেশিক মুদ্রার বিপরীতে উৎস দেশে অধিকাংশ সময়েই আসে মাদক বা জংগী অর্থায়নের মতো ক্ষতিকর পণ্য বা সেবা। হুন্ডি চ্যানেলে পরিশোধিত অর্থে যেসব সেবা বা পণ্য বাংলাদেশে আসে, তা দিয়ে উন্নয়নমূলক বা ইতিবাচক কিছু যেমন, করোনা টিকা, পদ্মা সেতু কিংবা মেট্রোরেলের কনসালটেন্সি ফী পরিশোধ হয়, এমন সম্ভাবনা প্রায় শুন্য।

তিন, দেশের অর্থনীতি দুর্বল হলেও হুন্ডির মাধ্যমে থেকে যাওয়া বৈদেশিক মুদ্রা দেশ ও বিদেশে অবস্থানরত মানব পাচার দলসহ দেশের স্বার্থবিরোধী দল বা গোষ্ঠীকে অধিকতর শক্তিশালী করে এবং বিপরীতে দেশের প্রশাসন ব্যবস্থাকে ক্রমাগত দুর্বল থেকে দুর্বলতর করে।

মানব পাচারের ভিকটিম কর্তৃক অর্জিত অর্থ যত কম বা বেশিই হোক না কেন তা কদাচিৎ ব্যাংকিং চ্যানেলে আসছে বা আসতে পারছে; তাই, মানবাধিকারের গুরুতর লঙ্ঘন, বহি:বিশ্বে দেশের সুনামহানি এসব বিবেচনায় না এনেও কেবল অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটেও মানবপাচার দেশের ক্ষতি, কেবল ক্ষতিই করছে।

বাংলাদেশে কেবল মাদকের ব্যয় বছরে এক লক্ষ কোটি টাকা বা ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা দিয়ে কিনা প্রতিবছর ৩টি করে পদ্মা সেতু তৈরি করা সম্ভব। বাংলাদেশে মানবপাচার জনিত ব্যয়ের কোন পরিসংখ্যান নেই। মানবপাচারের ক্ষতির ধরণ ও ব্যাপকতা সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার জন্য মানবপাচার অপরাধলব্ধ আয়ের প্রবাহচিত্রকে মাথায় রেখে এখানে দু'টো উদাহরণ তুলে ধরা হলো।

উদাহরণ ১। ২০০৭ সালে ২ লক্ষ ৭৩ হাজার শ্রমিককে বাংলাদেশ থেকে মালয়েশিয়ায় 'বৈধভাবে' প্রেরণ করা হয়েছিল। রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো অভিবাসন ফি বাবদ অফিসিয়ালি নির্ধারিত ৮৪ হাজার টাকার পরিবর্তে জনপ্রতি ২ বা ২.৫ লক্ষ টাকা বা তার বেশি পরিমাণ অর্থ আদায় করেছে এবং তাদের অনানুষ্ঠানিক হিসেব মতে তারা শ্রমিক প্রতি গড়ে বাংলাদেশী টাকার হিসাবে ১ লক্ষ টাকা করে কেবল গন্তব্য দেশের বিভিন্ন দপ্তরগুলোতে অবৈধভাবে ব্যয় করার জন্য নিয়েছে। তাদের দাবি সত্য হয়ে থাকলে কেবল এক বছর (২০০৭ সালে) একটি দেশে (মালয়েশিয়া) ২,৭৩০ কোটি টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা (সে সময়ের হিসেবে প্রায় ০.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) হারিয়েছে বাংলাদেশ। এই অর্থ অবশ্যই ব্যাংকিং চ্যানেলে বৈধভাবে যায়নি। গিয়েছে হুন্ডির মাধ্যমে। আসলে এই পরিমাণ অর্থ মালয়েশিয়ায় বৈধ বা অবৈধভাবে থাকা প্রবাসী বাংলাদেশীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে তথাকথিত পারিতোষিক প্রদান করা হয়েছে এবং তার বিপরীতে নবীন শ্রমিকদের কাছ থেকে বাংলাদেশে আদায় করা অতিরিক্ত অর্থ বিদ্যমান প্রবাসী শ্রমিকদের আত্মীয়-স্বজনের কাছে পরিশোধ করা হয়েছে। অর্থাৎ এই পরিমাণ অর্থ বাংলাদেশে বৈধ চ্যানেলে আসতে পারেনি; বরং অবৈধভাবে গন্তব্য দেশে রয়ে গেছে। লক্ষ্য করুন, প্রবাসী শ্রমিকদের স্বজনদের কাছে বিলিকৃত ২,৭৩০ কোটি টাকা প্রবাসে গমনেচ্ছু নতুন শ্রমিকদের কাছ থেকেই অতিরিক্ত ফি হিসাবে অবৈধভাবে আদায় করা হয়েছে। সবশেষে বোনাস ক্ষতি হিসেবে বাংলাদেশী রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো মালয়েশিয়ার সরকারী দপ্তরগুলো কলুষিত করে ফেলছে এ অজুহাত তুলে মালয়েশিয়ান সরকার পরবর্তী অনেকগুলো বছর বাংলাদেশ থেকে জনশক্তি আমদানী বন্ধ রাখে।

উদাহরণ ২। মানব পাচারকারীদের কয়েকটি দল মধ্যপাচ্যের বিভিন্ন দেশে মানসম্মত চাকরিতে নিয়োজিত কিছু প্রবাসী বাংলাদেশীকে ইউরোপে প্রেরণের প্রলোভন দেখিয়ে ইরানে জড়ো করে প্রত্যেকের কাছ থেকে গড়ে ৬ লক্ষ টাকা করে মুক্তিপণ আদায় করেছিল। কেবল ২০১৩ সনেই এ ধরনের ২০০০ শ্রমিককে উদ্ধার করে বাংলাদেশ ফেরত পাঠানো হয়েছে বলে দূতাবাস সূত্রে জানানো হয়েছিল। আমরা যদি শুধু একটি দেশে একটি বছর এই একটি খাতে ক্ষতির হিসাব করি, তবে তা দাঁড়ায় নিম্নরূপ।

এক, ২ হাজার শ্রমিকের প্রত্যেকের বাংলাদেশী স্বজন থেকে গড়ে ৬ লক্ষ টাকা হারে মোট ১২০ কোটি টাকা (সে সময়ের হিসাবে ২ কোটি বা ২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সমপরিমাণ) আদায় করা

হয়েছে। বাংলাদেশে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে বা ঋণ করে এসব মুক্তিপণের অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে বলে ২০০০ পরিবারের দরিদ্রতা বেড়েছে।

দুই, এর সমপরিমাণ অর্থ মধ্যপ্রাচ্যের শ্রমিকদের (আটক করা ভিকটিম শ্রমিক নয়) কাছ থেকে বৈদেশিক মুদ্রায় সংগ্রহ করে পাচারকারী চক্রকে দেয়া হয়েছে এবং একই সাথে বাংলাদেশে দেশীয় মুদ্রায় মুক্তিপণবাবদ আদায়কৃত অর্থ হুন্ডি প্রক্রিয়ায় প্রবাসীদের স্বজনদের কাছে বিলি করা হয়েছে। তার মানে, বাংলাদেশে বৈধ চ্যানেলে ২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আসতে পারেনি, অর্থাৎ বাংলাদেশ ২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা হারিয়েছে।

তিন, মধ্যপ্রাচ্য থেকে আসা এ ২০০০ শ্রমিক ইউরোপে চাকরির প্রলোভনে পড়ে পালিয়ে এসেছে বলে তাদের কেউই পুরনো চাকরি ফেরত পায়নি; অর্থাৎ বাংলাদেশ মধ্যপ্রাচ্যে তার ২ হাজার নিয়মিত চাকুরী হারিয়েছে।

চার, বাংলাদেশে ২০০০ বেকার বেড়েছে।

পাঁচ, দেশে ও বিদেশে বাংলাদেশের সুনাম ও মর্যাদাহানি হয়েছে।

ছয়, ২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ে মানব পাচার চক্র আরও শক্তিশালী হয়েছে, দেশে ও বিদেশে এ চক্রের প্রভাব ও পায়তারা বাড়িয়েছে এবং ভিকটিমদের মধ্য থেকে কিছু লোককে মানবপাচার দলের নতুন রিক্রুট হিসেবে যোগদান করিয়েছে এবং তাদের মাধ্যমে নতুন নতুন ভিকটিম বানানোর পায়তারা অব্যাহত রেখেছে।

সাত, এ ২০০০ ভিকটিমের একটি বড় অংশ পাচারকারীদের তত্ত্বাবধানে থেকে খুব অল্প পয়সায় বা বিনা পয়সায় বিদেশি কারখানা বা প্রতিষ্ঠানে শ্রম দিয়েছে; তাদের বন্ডেড লেবার-এর বিনিময়ে অর্জিত অর্থ পাচারকারীদের হাতেই গিয়েছে; অর্থাৎ তার বিনিময়ে বাংলাদেশ কিছুই পায়নি।

এসব ঘটনার বিপরীতে এমন কোন উদাহরণ দেখানো কঠিন, যেখানে মানব পাচার থেকে দেশ আর্থিক বা অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হচ্ছে বলে দেখানো যাবে।

অতএব, মানবপাচার বৈধ রেমিটেন্স প্রবাহকে ব্যাহত করে, মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রাকে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বাইরে আটকে রাখে এবং মাদক, সন্ত্রাসী অর্থায়ন ও অন্যান্য সংগঠিত অপরাধকে আর্থিকভাবে আরও শক্তিশালী করে তোলে। এর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে রাষ্ট্রের প্রশাসনিক সক্ষমতা ও সামগ্রিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ক্রমাগত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। মানবাধিকার লঙ্ঘন ও সামাজিক বিপর্যয়ের বিষয়গুলো উপেক্ষা করেও কেবল অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের আলোকে বলা যায়—মানবপাচার একটি সর্বাত্মক ক্ষতির উৎস, এটি কোনো অবস্থাতেই দেশের জন্য অর্থনৈতিক সুফল বয়ে আনে না। মানবপাচার প্রতিরোধ কেবল নৈতিক বা মানবিক দায়িত্বের বিষয় নয়; এটি দেশের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, আর্থিক শৃঙ্খলা এবং দীর্ঘমেয়াদি রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্য একটি অপরিহার্য কৌশলগত প্রয়োজন।